সাহিত্য মালিকা

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

Recommended as a suitable Text-book
for Class VIII of all Schools of West Bengal & Tripura
by the West Bengal Board of Secondary Education
[Vide Notification No. TB/76/8/TB/18 Dated 27.12.76]

সাহিত্য মালিকা

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

ডক্টর শান্তিকুমার দাশগুপ্ত এম্.এ., পি. এইচ-ডি.
অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ, কলিকাতা
প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দি নিউ বুক ষ্টল
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট.কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
দি নিউ বুক স্টলের পক্ষে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৭৫

মূল্য : তিন টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র।

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমলেন্দু পান এম.এ.
রামকৃষ্ণ মুদ্রণালয়
২০৯-বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

নদীর মত নিম্নগামী হও

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল, এবং ঘন ঘন ধারা পর্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়।

একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্যে স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা? সেই সর্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে।

এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী

পুরুষের গম্ভীর আদেশ বাণী শুনিলাম, "তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি; আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল; মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লান ভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম, ভাল নিদ্রা হইল না।

অনুশীলনী

১। 'নদীর মত নিম্নগামী হও' বলিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি বুঝাইয়াছেন তাহা সহজ ভাষায় লেখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) আবার সেই···সমাকুল করিল। [অনু—১]

(খ) এই সময়ে আমি···দেখিয়া বেড়াইতাম। [অনু—১]

(গ) সেই সর্বনিয়ন্তার···হইতেই হইবে। [অনু—২]

(ঘ) আমার মনের গতি···ফিরিয়া আইলাম। [অনু—৪]

৩। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

প্রাদুর্ভূত, সমাকুল, অক্ষয় পুরুষ, সম্বৎসর, কন্দরে, প্রস্রবণ, প্রবাহিত, প্রমত্ত, অপ্রতিহত, মগ্ন, ধাবমান, ক্লেদ, আবর্জনা, সর্বনিয়ন্তা, কর্দম, উর্বরা, শস্যশালিনী, নিম্নগামিনী, অন্তর্যামী, উপরত, কর্ণ বধির, ব্যাকুল।

অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া, বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব, শ্রবণমাত্র, সাধুবাদ প্রদান পূর্বক বলিলেন, মহারাজ! উত্তম সংকল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি; অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পূর্বতন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সম্পাদিত হইলেই, আপনকার রাজ্যাধিকার আর কোনও অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! ইনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই, কর্তব্য নিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্তী অনুজেরা, তৎক্ষণাৎ, আন্তরিক অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন।

তখন রাম বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্তব্যতাবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনকার কি অনুমতি হয়। বশিষ্ঠদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামচন্দ্র অনুজদিগকে বলিলেন, দেখ, যখন কর্তব্য স্থির হইল তখন আর অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তোমরা সত্বর সমস্ত আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর। সময়নির্দেশ পূর্বক, সমস্ত নগরে ও জনপদে এ বিষয়ের ঘোষণা করিয়া দাও। লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদ্বর্গের পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্যে, অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে, আমি পরম সুখী হইব। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যাবতীয় ঋষিদিগের নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি, অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গিয়া, যজ্ঞভূমি নির্মাণের উদ্‌যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যের যথোচিত আয়োজন করিয়া, তৎসমুদয় সত্বর তথায় পাঠাইয়া দাও। দেখ, যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্তে, নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; অতএব, যত্ন পূর্বক, সমস্ত বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন, কোনও বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন, কাহারও কোনও অংশে ক্লেশ বা অসুবিধা না ঘটে। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী; তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু

আমি এক বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম বলিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতির আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব, জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা হইবেক। শ্রবণমাত্র, রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি, কিয়ৎক্ষণ, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক, নয়নের অশ্রু-মার্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধ মাত্র হয় নাই; এক্ষণে, কি কর্তব্য উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব, অনেকক্ষণ একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া, বলিলেন, মহারাজ! পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে, আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সকলেই এককালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ; কেবল লোকবিরাগ-সংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাস দিয়া, জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। সীতার মোহিনী মূর্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে, উপস্থিত কার্যের অনুরোধে পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দারপরিগ্রহ বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, সে বিষয়ে একান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া, মৌন ভাবে, অবনত বদনে, অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এই রূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্বাগ্রে নৈমিষক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন; এবং, সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমির নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ অন্তরে, পৃথক পৃথক প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের জন্যে, তাহাদের অবস্থোচিত অবস্থিতিস্থান[১] নির্মিত করাইলেন। লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে, অশেষবিধ অপর্যাপ্ত আহার সামগ্রী ও শয্যা যান প্রভৃতির সমবধান করিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের মোচন পূর্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্য-নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন।

অনুশীলনী

১। কিরূপে যজ্ঞের প্রস্তুতি হয় তাহা তোমার ভাষায় প্রকাশ কর।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) আপনি সসাগরা…অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। [অনু—১]

(খ) যত্ন পূর্বক, সমস্ত বিষয়ের…না ঘটে। [অনু—৩]

(গ) বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! …উপদেশ করুন। [অনু—৪]

(ঘ) রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ…জাগরূক ছিল। [অনু—৫]

(ঙ) কিন্তু রামচন্দ্র…মীমাংসিত হইল। [অনু—৫]

৩। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

কৃতসংকল্প, অভিপ্রায়, একাধিপত্য, অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব, সম্পাদিত, অভিলষিত, বিধেয়, সমাগম, নিবন্ধন, পারদর্শী।

১। অবস্থা অনুযায়ী বসিবার স্থান।

সে কাল আর এ কাল

আমাদের শিক্ষা ও মাতৃভাষা



রাজনারায়ণ বসু

এক্ষণে স্কুল, কালেজে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে কি বিশেষ উপকার দর্শিতেছে ? কৈ অদ্যাবধি দুই একটি লোক ব্যতীত সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান বিষয়ে কেহ কিছু নূতন রকম লিখিতে অথবা নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্কুল কিম্বা কালেজ পরিত্যাগ করিয়া লেখাপড়ার চর্চা অধিকাংশ লোক ছাড়িয়া দেয়। আমি স্বীকার করি, জীবিকা উপার্জনের জন্য যাঁহাদিগকে সমস্ত দিবস আফিসে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা সন্ধ্যার পরে আসিয়া যদি কিছু না করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কতকটা ওজর আছে ; কিন্তু যাঁহাদের সময় আছে, উপায় আছে, তাঁহারাও যে কালেজ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনা একেবারে ত্যাগ করিয়া বসেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। কোন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া কিম্বা কোন নূতন ভাবের কাব্য রচনা না হইবার বিশেষ কারণ এই। কালেজ অথবা স্কুল ছাড়িয়া লেখাপড়ার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ করিলে কি প্রকারে এই প্রকার আবিষ্ক্রিয়া বা কাব্য রচনা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ? যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লেখাপড়ার চর্চা রাখেন, তাঁহারা আবার কেবল হীন অনুকরণে রত। প্রাচীন কবি কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রাম বসু, ইঁহাদের কবিতা যেন ঠিক স্বভাবের হস্ত হইতে বাহির হইয়াছে। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে সেরূপ

সহৃদয়তা দেখা যায় না। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার কোন কোন কাব্যে পূর্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত আছে বটে; কিন্তু জাতীয় ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে। এই ত গেল লেখার বিষয়, কথোপকথনে এই হীন অনুকরণ আরো স্পষ্ট দেখা যায়। তাহার প্রধান চিহ্ন ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ একত্র মিশাইয়া বলা। আমরা এক্ষণে যেরূপ কথা কহি, তাহা শুনিলে ইংরাজেরা কিম্বা অন্য কোন বিদেশীয় লোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। * * * * *

এ বিড়ম্বনা কেন? সমস্তটা বাঙ্গালায় না বলিতে পার, কেবল ইংরাজীতে কেন বল না? তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল। কোন কোন স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলে না, যথা;—ডেস্ক, বেঞ্চ, টাউনহল, গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি। কিন্তু যে স্থলে বাঙ্গালা শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা অন্যায়। যাঁহারা ইংরাজী কিছু জানেন না, ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য তাঁহারা বাঙ্গালার সঙ্গে আরো ইংরাজী শব্দ মিশাল করিয়া বলেন। কোন কোন ভট্টাচার্য এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহাতে আরো হাসি পায়। ইংরাজী গ্রন্থকর্তা সদি (Southey) বলিয়াছেন, "আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ ভাষা, অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজী ও জর্মাণ ভাষার পরস্পর জ্ঞাতিত্ব অনুরোধে জর্মাণ ভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু যেখানে একটি খাঁটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেখানে যে ব্যক্তি লাটিন অথবা ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার করে, মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য তাহাকে ফাঁসি দিয়া তাহার শরীর খণ্ড বিখণ্ড করা উচিত।" যাঁহারা বাঙ্গালা কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে একবারে এরূপ উৎকট দণ্ড না করিয়া একটি ভদ্র উপায় প্রথম অবলম্বন

করিলে ভাল হয়। যদি দেখা গেল, ভদ্রতায় কিছু হইল না, শেষে সদি-বিহিত দণ্ড আছে। * * * * *

শুদ্ধ গ্রন্থ লেখা ও কথোপকথনে হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়, এমন নহে ; সকল বিষয়েই ঐ হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে লেখা হয়। কোন্ ইংরাজ ফ্রেঞ্চ অথবা জর্মাণ ভাষায় স্বদেশীয় লোককে পত্র লিখে? যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী লিখিতে শিখিতেছেন, তাঁহারা ঐ ভাষায় লেখা অভ্যাস করিবার জন্য ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক লোকে এরূপ করেন কেন? বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হয় কেন? ইহার মানে কি? যে সভার সভ্যেরা বাঙ্গালী, সে সভার কার্যবিবরণ ইংরাজীতে রাখা হয় কেন? ডিবেটিং ক্লব, জুবিনাইল ক্লব প্রভৃতি সভা, যাহার উদ্দেশ্য ইংরাজী চর্চা এবং ইংরাজী শিক্ষার্থী বালকেরা যাহার সভ্য, সে সকল সভার সভ্যেরা ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য সভার কার্যবিবরণ ইংরাজী ভাষাতে রাখিতে পারেন, কিন্তু প্রবীণ লোকের সভা যাহা অন্য উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সভ্যেরা তাহার কার্যবিবরণ ইংরাজীতে রাখিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না! যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে এত বাক্য ব্যয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, যাহাতে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হয়, তাহা কখন অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে হইতে মহৎ বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইবে। আর এক কথা এই, যাহা মাতৃভাষাসম্বন্ধীয়, তাহা আমরা আদৌ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি কেন?

অনুশীলনী

১। রাজনারায়ণ বাবুকে অনুসরণ করিয়া প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়টি কি তাহা বুঝাইয়া বল।

২। মাতৃভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকের চিন্তাধারাটি পরিস্ফুট কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) প্রাচীন কবি কবিকঙ্কণ···বাহির হইয়াছে। [অনু—১]

(খ) যাহারা ইংরাজী কিছু···করিয়া বলেন। [অনু—২]

(গ) ইংরাজী ও জর্মাণ···করিতে পারি। [অনু—২]

(ঘ) যাহাতে জাতীয়···সঞ্চারিত হইবে। [অনু—৩]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

প্রদত্ত, অদ্যাবধি, আবিষ্ক্রিয়া, সমর্থ, পরিত্যাগ, জীবিকা, উপার্জন, পরিশ্রম, বিড়ম্বনা, অপেক্ষাকৃত, ভাষাজ্ঞতা, জাতিত্ব, বিদ্রোহাচরণ, উৎকট, সংস্থাপিত, অকিঞ্চিৎকর, গৌরবেচ্ছা, সঞ্চারিত, আদৌ।

বঙ্গদেশের কৃষক জমীদার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করে না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দশা হউক না কেন, এই সর্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃদগণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চূড়া, কে না তাহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র

হইল। তাহা হইলে, আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্তব্য কার্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব—অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, উপহসিত, অমর্যাদাপ্রাপ্ত হইব—বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে,—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,—যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মার্জনা করিবেন,—এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্তকণ্ঠেই বলিব।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমীদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের

সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী ; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য একথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায়' বুঝিবেন না।

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে ; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল—অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি—তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজনা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহারও বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজনা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা ; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা

হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸৹ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজনা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্তির জন্য

অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি ? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে ?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজনা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজনা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার ! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন

বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা 'রিলিফ', কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে।

অনুশীলনী

১। "জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।"—বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি বিশদ কর।

২। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া কৃষকের জীবনচিত্র পরিস্ফুট কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) জমীদার প্রকৃতপক্ষে……দয়ার কাজ। [অনু—১]

(খ) যে লেখনী আর্তের……নিষ্ফলা হউক। [অনু—২]

(গ) পরে যাহা বাকি……হইতে পারে না। [অনু—৪]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

ভূস্বামী, বৃহজ্জন্তু, সফরী, উদরস্থ, হৃদয়শোণিত, সর্বরত্নপ্রসবিনী, কর্ষণ, জীবনোপায়, দ্বেষক, সুহৃদ, মূক, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, প্রতিপন্ন, পরাঙ্মুখ, নিঃসৃত, নিষ্ফলা, বর্তে, দুই বিশ, চর্বিত ইক্ষু, পল্বল, মৃত্তিকা, দাখিলা, পার্বণী, হকদার, অভিপ্রায়, অপহরণ, পুণ্যাহ, নিঃস্ব।

বৌদ্ধ শীলভদ্র

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, হিউয়ান্ চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। হিউয়ান্ চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙালী। ইহা বাঙালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। হিউয়ান্ চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ; বড় বড় রাজা এমন কি সম্রাট হর্ষবর্ধন পর্যন্ত তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু সে পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। হিউয়ান্ চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক-এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া

ছিল। এ ত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড় বড় মহাযানবিহারের কর্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত, কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল—তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকাটিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদিগ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি হিউয়ান্ চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। হিউয়ান্ চুয়াং-এর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, 'চীন একটি মহাদেশ, হিউয়ান্ চুয়াং ঐখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন কুমাররাজ ভাস্করবর্মা হিউয়ান্ চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে এখনও বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতিপ্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত

ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল তখন সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ধর্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্মপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধর্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধ ধর্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্‌ধর্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।" শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন, "এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে?" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। তিনি শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন, না বচনের উত্তর দিতে পারিলেন, লজ্জায় অধোবদন হইয়া তিনি সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "অমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম কিরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া দিলেন।

হিউয়ান্ চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মানুরাগ, নিষ্ঠা, প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন।

তিনি দশ-কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকাটিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

অনুশীলনী

১। বৌদ্ধ শীলভদ্রের জীবন-কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। 'হিউয়ান্ চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়'—কাহাদের চেয়ে বড়? হিউয়ান্ চুয়াং কে? তাঁহার পরিচয় যতটা জান লেখ।

৩। শীলভদ্র বলিলেন, 'আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি'—শীলভদ্র কাহাকে বলিলেন? কোথায় যাওয়ার কথা তিনি বলিয়াছেন। সেখানে গিয়া তিনি কি করিয়াছিলেন?

৪। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) শীলভদ্রের ধর্মানুরাগ পাওয়া যায়। [অনু—১]

(খ) বৌদ্ধধর্মের আদিত্য…সদ্ধর্মের উন্নতি নাই। [অনু—২]

৫। অর্থ ও বানান অভ্যাস কর:

প্রশিষ্য, বিহার, বহুদর্শী, অধ্যয়ন, টীকাটিপ্পনী, দূরদর্শিতা, প্রতিপত্তি বোধিসত্ত্ব, আদিত্য, অস্তমিত, কাষায়, জ্ঞানজ্যোতি, নির্বাণ, সঙ্ঘারাম।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়



বিপিন চন্দ্র পাল

আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন ক্রমে সে কথা ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্যন্ত হয় না কেন?

উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু আমাদের বড় বড় সন্ন্যাসীদের যেমন শিষ্যসেবক থাকে, উপাধ্যায় মহাশয়ের সেরূপ শিষ্যসেবক কেহ ছিল না। সে আকাঙ্ক্ষাও উপাধ্যায় মহাশয়ের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সন্ন্যাস অন্য ধরনের ছিল। গীতা যাহাকে সর্বকর্মন্যাস বলিয়াছেন, উপাধ্যায় মহাশয়ের সন্ন্যাস সে জাতীয় ছিল। আপনার বলিতে সংসারে তিনি কিছু রাখেন নাই। আজন্ম ব্রহ্মচর্য সাধন করিয়া, তিনি এমন একটা অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁর অহং-জ্ঞানটা ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণতর সম্বন্ধ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আধুনিক কর্মনায়কগণের মধ্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের মতন আর কেহ এতটা পরিমাণে সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

* * * *

সন্ন্যাসের সঙ্গে সচরাচর সমাজ-জীবনের একটা বিরোধ জাগিয়া উঠে। সন্ন্যাস লইয়া লোকে প্রায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। উপাধ্যায় মহাশয় সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারত্যাগী হন নাই। ফলতঃ

তাঁর মধ্যে চিরদিনই এমন একটা প্রবল ও সজীব সমাজানুগত্যের ভাব দেখিয়াছি, যার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর সন্ন্যাসের আদর্শের কোন প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতি সাধন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। আমাদের সন্ন্যাসীরাও কোন কোন বিষয়ে একান্তভাবে লৌকিকাচারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলেন, সত্য। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের সমাজানুগত্যের সঙ্গে ইঁহাদের সমাজানুগত্যের একটা জাতিগত প্রভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রাচীন মতের সন্ন্যাসীগণ লোক-সংগ্রহার্থে, কর্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভেদ যাহাতে না জন্মায় তার জন্য লৌকিকাচারের অনুবর্তিতা করিয়া চলেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের সমাজানুগত্যের অন্তরালে কোন লোক সংগ্রহেচ্ছা কখনো দেখিতে পাই নাই। তাঁর অকৈতব স্বদেশভক্তির উপরে এই অদ্ভুত সমাজানুগত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আর ইহাই উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার বিশেষত্ব ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় তাঁর নিজের দেশকে ও সমাজকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা আজি পর্যন্ত সে চক্ষু লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের স্বদেশপ্রেম অতি হাল্‌কা বস্তু। আমরা এ পর্যন্ত গোটা দেশটাকে ভালবাসিতে শিখি নাই। আমরা দেশটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখি। কিয়দংশ বা তার ভাল, আর কিয়দংশ বা তার মন্দ, এরূপভাবে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার ভাল-মন্দের মধ্যে আমরা একটা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে ভাল লাগে, তাহাকেই ভালবাসি ; আর যেটুকু লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করিয়া, তাহা হইতে নিজেদের যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু প্রকৃত প্রেমের ধর্ম এ নহে। ভাল-ও-মন্দ জড়িত যে প্রেমের পাত্র প্রেমিকের চিত্ত আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে গোটাভাবেই দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে প্রীতি করে। যার

এ প্রেম নাই, সে ভালমন্দ মিশ্রিত বস্তু বা ব্যক্তির ভালকে ভাল করিয়া বোঝে না; মন্দকেও ভাল করিয়া ধরে না। প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেমের মতন এমন চক্ষুষ্মান আর কিছু নাই। প্রেম অপরের চাইতে কম দেখে না বেশী দেখে। ......মন্দের মধ্যেও যে ভালটুকু লুকাইয়া আছে, সে তাহাকেও দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়া তাহা হইতে ফিরিয়া আসে না।

উপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের পুরাগত সভ্যতা ও সাধনাকে এইরূপ প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়া তাঁর নিকটে স্বদেশবস্তু যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকের নিকটেই সেরূপ করিয়াছে।

* * * *

উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেয়টুকুকে, স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতাটুকুকে ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁর উদার কোমল প্রাণ মজিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অমন করিয়া স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে, স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন! তাঁর চক্ষে আমাদের ভাল, আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের সৌন্দর্য আমাদের কদর্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত।

অনুশীলনী

১। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চরিত্রের পরিচয় দাও।

২। 'প্রেমের মতন এমন চক্ষুষ্মান আর কিছু নাই'—লেখক একথা কেন বলিয়াছেন?

৩। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) গীতা যাহাকে···ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। [অনু—২]
(খ) আমাদের প্রাচীন···গড়িয়া উঠিয়াছিল। [অনু—৩]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:
সর্বকর্মত্যাগ, কর্মনায়ক, সর্বভূতে, আত্মদৃষ্টি, সমাজানুগত্য লৌকিকাচার, লোকসংগ্রহার্থে, কর্মাসক্ত, অনুবর্তিতা, অকৈতব, চক্ষুষ্মান, পুরাগত, আত্মপ্রকাশ।

সমবায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া খেতের পর খেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এই সব জমি চাষ করে। কারো-বা দুই বিঘা জমি কারো-বা চার কারো-বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা। এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয় হালের গোরু কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা যথেষ্টের চেয়ে বেশি, কোথাও বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও-বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয়, কোথাও সময় বহিয়া যায়। তার পরে আঁকাবাঁকা সীমানায় হাল বারবার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে; প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার

ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড়ো মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশি মুনাফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশী কাজ করিতে পারে তারই জিত। এইজন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে। হাতিয়ার মানুষের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়-বোনা, বোঝা-বহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙল, তাঁত, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মানুষের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের পরিমাণ বাড়াইয়াছে। ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশি তফাত থকিত না।

এইরূপে হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতেছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ইহা লইয়া যতই কান্নাকাটি করি, কপাল চাপড়াইয়া মরি, ইহার আর উপায় নাই।

একথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এসব কথা পরের কারখানা-ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবা যায় না। নিজে হাতে-

কলমে ব্যবহার করিলে, তবে স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ-আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই হুহু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে অাঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কী তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়। ভালো করিয়া চাষ দিবার জন্য অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কষ্টে হাল-লাঙলে অল্প জমিতে অল্প একটু অাঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পর দীর্ঘকাল যদি ভালো বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সে বৎসর নাবী বুনানি হইয়া বর্ষার জলে হয়তো কাঁচা ফসল তলাইয়া যায়। তার পরে ফসল কাটিবার সময় দুর্গতি ঘটে। কাটিবার লোক কম, বাহির হইতে মজুরের আমদানি হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। কলের লাঙল, কলের ফসল-কাটা যন্ত্র থাকিলে সুযোগমাত্রকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বাঁচে।

কিন্তু কল চালাইতে হইলে জমি বেশি এবং অর্থ বেশি চাই। অতএব গোড়াতেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের গরিব চাষীদের পক্ষে ইহা অসম্ভব, তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্য কারিগরকে পিছন হঠিতে হঠিতে মস্ত একটা মরণের গর্তে গিয়া পড়িতে হইবে।

যাহাদের মনে ভরসা নাই তাহারা এমন কথাই বলে এবং এমনি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া, সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে

হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যবসা করিতে পারে না। কিন্তু এক-শো দেড়-শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেন্মার্ক প্রভৃতি ছোটো ছোটো দেশে সাধারণ লোকে এইরূপ জোট বাঁধিয়া মাখন পনির ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। এই সকল ব্যবসায়ের যোগে সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে। এমনি করিয়া শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় সে বড়ো হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজকাল কো-অপারেটিভ-প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়, ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে শস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে

করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক-এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ্ হইয়া, সহায় হইয়া মিলিতে পারিবে।

অনুশীলনী

১। সমবায় কাহাকে বলে? সমবায়ের সুবিধা কি?

২। 'সমবায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চাষীর দারিদ্র্য দূর করিবার যে উপায় দেখাইয়াছেন তাহা বিশদ কর।

৩। 'ঢের লোকে এই সব জমি চাষ করে'—কিভাবে এই চাষ হয়?

৪। 'এমনি করিয়া শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় সে বড়ো হইয়াছে'—'এমনি করিয়া' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন?

৫। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) যার বড়ো মূলধন…বাঁচিয়া যায়। [অনু—১]

(খ) মানুষ গায়ের জোরে…কৌশলেই জিতিয়াছে। [অনু—২]

(গ) এসব কথা পরের…স্পষ্ট বোঝা যায়। [অনু—৪]

(ঘ) আজ এই কলের যুগে…গিয়া পড়িতে হইবে। [অনু—৫]

(ঙ) ধনী আপন টাকার…তুলিতে পারে না। [অনু—৬]

৬। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

মেহন্নত, স্বতন্ত্র, অপব্যয়, হাতিয়ার; হলধারী, নাবী বুনানি, দুর্ভিক্ষ, আশঙ্কা, প্রণালী, জীবিকানির্বাহ, সুহৃদ্।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা

ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

ভারতবাসী স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, বস্তুতন্ত্রতাহীন ভাবাতিশয্য তাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ—একথা কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকের কৃপায় বিরামবিহীনভাবে আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়েছে। সেই কুশিক্ষার ফলে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত বলতে আরম্ভ করেছেন, ভারতবর্ষ চায় সৌন্দর্য, সুষমা, আলো, মলয়বাতাস, বকুল-জুঁইয়ের প্রাণ-মাতান গন্ধ, বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। ভারতবর্ষের বহিঃপ্রকৃতিই নাকি এর জন্য দায়ী। প্রাচীন ভারতে অল্প আয়াসেই খাওয়া-দাওয়া জুটে যেত বলে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা মোটেই ছিল না ; সুতরাং জগৎ মায়া, সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত, সমাধি ; তাল প'ড়ে ঢিপ শব্দ হয়, না ঢিপ ক'রে তাল পড়ে—এই সমস্ত আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ মিলেছিল। তাই ভারতবর্ষে কাব্য দর্শনের ছড়াছড়ি, কিন্তু বিজ্ঞানের কোন চর্চা হয় নি—এইরূপ প্রচার খুব সুনিয়ন্ত্রিত ভাবেই হয়েছে। এটা ইউরোপীয় রাজনৈতিক প্রচার-চাতুরীর ফল।

আসল কথা এই যে, প্রাচীন ভারত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা সকল বিষয়েই খুব উন্নত ছিল। সবদিক দিয়ে বিচার করলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতে কোন দেশ এতটা উন্নত ছিল না। কিন্তু ভগবান পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার প্রাচীন ভারতের ঘরে বন্ধ ক'রে দরজায় চাবি দিয়ে রেখেছেন এ কথা অন্ধভক্তেরা বিশ্বাস ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও, কোনো সুবিবেচক লোক তা বিশ্বাস করতে

সুন্দর একটি নৌশিল্প গড়ে উঠেছিল। জাহাজ যাতায়াতের সময় দিক্ ঠিক করার জন্য তারা 'মাছযন্ত্র' (তেলের উপর ভাসমান চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন মৎস্যাকৃতি লৌহযন্ত্র) ব্যবহার করত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু গণকরা দিক্ ঠিক করবার জন্য চুম্বক ব্যবহার করত।

মঞ্জিষ্ঠা ও নীলের দ্বারা সূতা পাকা লাল ও নীল রঙ্ করার প্রণালী ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল থেকে চলিত ছিল। ফিটকারী নামক রাগবন্ধনীর সাহায্যে মঞ্জিষ্ঠার দ্বারা তারা বেশ টকটকে পাকা লাল রঙ্ প্রস্তুত করত। রাগবন্ধনীর এবং নীলের পাতা থেকে নীল রঙের আবিষ্কার হিন্দুদের। ফলিত-রসায়নের এই সমস্ত ও অন্যান্য আবিষ্কারের ফলে জগতের ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে ছিল। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় নানাপ্রকারের গন্ধদ্রব্য, প্রসাধনের জিনিষ, চুলের কলপ ইত্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী রয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানে কোনো জাতিই প্রাচীনকালে খুব বেশী উন্নতিলাভ করতে পারেনি। যদিও অঙ্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎসা বা রসায়ন বিজ্ঞানের মতো এ শাস্ত্রে হিন্দু প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি তাপ, কিরণ, শব্দ ও চৌম্বকশক্তি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান তাদের ছিল। তারা কাচ থেকে বৃত্ত ও বর্তুল তাল (spherical ও oval lenses) তৈরী করতে জানত। তালের সাহায্যে সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত ক'রে তারা কাগজ বা খড়ের মতো সহজদাহ্য পদার্থে আগুন লাগাত। আলোকরশ্মির বক্রণ ও প্রতিফলন সম্বন্ধে তাদের বেশ জ্ঞান ছিল!

হিন্দুরা বৎসরে বৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার করত। আকাশের বিভিন্ন প্রকারের মেঘ এবং

বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য বিষয়ও তারা পর্যবেক্ষণ করত অর্থাৎ আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রথম অঙ্কুর বেশ সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়।

কৌটিল্য পড়লে এ কথা স্বতঃই মনে উদয় হয় যে ভারতবর্ষ তখন বিজ্ঞানেও উন্নত অবস্থায় পৌঁছে'ছিল এবং এই উন্নতি দীর্ঘ কালব্যাপী ক্রমোন্নতির ফলে অর্থাৎ হিন্দুরা অতি প্রাচীনকালেই বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন ক'রেছিল। বিজ্ঞানের সব দিক্ বিচার করতে গেলে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হিন্দুরা সমসাময়িক জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রেছিল। তাদের মনোবৃত্তি সম্পুর্ণ বৈজ্ঞানিক ছিল।

অনুশীলনী

১। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত কিরূপ উন্নত ছিল তাহা লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :

(ক) ভারতবাসী স্বভাবতঃ ...ধ্বনিত হয়েছে। [অনু—১]

(খ) ভারতবর্ষে কাব্য দর্শনের...প্রচার-চাতুরীর ফল। [অনু—১]

(গ) জগৎ অনেক বিষয়ে তাহাদের কাছে ঋণী,...এ কথাও সত্য। [অনু—২]

(ঘ) ভারতবর্ষ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক কিন্তু বাস্তবকে ভোলে নি। [অনু—৩]

(ঙ) তালের সাহায্যে.........বেশ জ্ঞান ছিল। [অনু—৮]

৩। ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :

আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, প্লিনি, কৌটিল্য।

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

বস্তুতন্ত্র, ভাবাতিশয্য, বিরামবিহীন, কর্ণকুহরে, ধ্বনিত, সুষমা, সম্প্রজ্ঞাত, সুনিয়ন্ত্রিত, আত্মতৃপ্তি, প্রভূত, অর্জন, অবনতি, সোপান, আরোহণ, সমকক্ষ, উচ্চাঙ্গ, আধ্যাত্মিক, আবর্ত, আকর্ষণ, উৎকর্ষ, মঞ্জিষ্ঠা, স্মরণাতীত, রাগবন্ধনী, প্রসাধন প্রণালী, দাহ্য, বক্রণ, প্রতিফলন, পূর্বাভাস, পরিমাপক, পর্যবেক্ষণ, অঙ্কুর, ক্রমোন্নতি, দ্বাদশ, সমসাময়িক, মনোবৃত্তি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্বামী বিবেকানন্দ



বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি,—ওরাও 'কালাদাস' বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখে নি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষামাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে, সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে-দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নির্বল হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র; একেবারে নির্বল, নিষ্কর্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বছরের নানারকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ, তো আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন— অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে

কেন গেল না, বিদেশীরা তখুনিই তো এসে চাষ-বাস করে বাস করতো, যেমন আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে? তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, বস্তু আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।

অনুশীলনী

১। ভারতীয়রা কিসের জোরে বেঁচে আছে?

২। 'সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন'—আলোচনা কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখ:

প্রত্যেক মানুষের······ভাষামাত্র। [অনু—৩]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

বহিঃপ্রকাশ, স্থিতি, নির্বল, নিষ্কর্মা, উৎসন্ন, বিজেতা।



রাসবিহারী বসু

শান্তিকুমার মিত্র

তাঁর জাপান-যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো স্বদেশের সহকর্মীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। সেজন্য তিনি সংহাই চললেন সেখানকার জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করতে ; কিন্তু ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে শীঘ্রই ফিরে এলেন। তিনি জাপানে আশাবু-তে একখানি ঘর ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন। সেখানেই তিনি খবর পেলেন চীনের বিপ্লবী নেতা তখন জাপানে। সান-ইয়াৎ-সেনও আমেরিকার চীনা বিপ্লবীদের কাছ থেকে রাসবিহারীর জাপানে আসার খবর পান। শীঘ্রই রাসবিহারী আশাবুর কাছে চীনা নেতার গৃহে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। উভয় নেতার মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হলো। এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভূমিকা নিয়েই মুখ্যত আলোচনা আবর্তিত হয়। চীনা নেতার মারফত মিৎসু তয়ামার সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয় ঘটে। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকার গদর পার্টির ভাই ভগবান সিং জাপান আসেন এবং পুলিশের নজর এড়াবার জন্য শিল্প-ব্যবসায়ী বলে আত্ম-পরিচয় দেন। ইয়োকোহমার সিন্ধী ব্যবসায়ীরা এক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে সিল্ক-ব্যবসায়ী ভগবান সিং ও মেডিকেল ছাত্র পি. এন. ঠাকুরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। পরস্পর কথা বলে তাঁরা দুজনেই রহস্যের আভাস পান। রাসবিহারী

পরের দিন ভগবান সিংকে তাঁর গৃহে নৈশাহারে নিমন্ত্রণ জানান। সে সময়ই তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের জানাশোনা হয়।

ভাই ভগবান সিং সম্প্রতিকালে মহানায়ক রাসবিহারীর ৭৫তম জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করতে কলকাতা এসেছিলেন। ঐ সময় তাঁদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে পরের কয়েকটি ঘটনা জানান। রাসবিহারী জার্মান দূতাবাসের কাছে তাঁর লেখা চিঠি নিয়ে আবার সংহাই যান। ভগবান ঐ চিঠিতে তাঁকে যে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই টাকা রাসবিহারীকে দিয়ে দিতে ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতে লিখেছিলেন। রাসবিহারী টাকা পান ও ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র চীনা এজেন্টের মারফত স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পথে ব্রিটিশ সেই অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পেয়ে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে। রাসবিহারী তাঁর 'আমাদের সংগ্রাম' শীর্ষক লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ করে গিয়েছেন যে, তিনি দু' জাহাজ বোঝাই অস্ত্রাদি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথে ব্রিটিশের হাতে সেগুলি ধরা পড়ে।

জাপান তখন প্রাচ্যের বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল। বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্তও আমেরিকা থেকে সেখানে আসেন। রাস-বিহারী খবর পেলেন, লালা লাজপৎ রায় শীঘ্র আমেরিকা যাওয়ার পথে জাপানে আসছেন। জাপানে লালাজীর অনেক ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। রাসবিহারী জাপানী প্রবাসী ভারতীয়দের অনেকের সঙ্গেই ততদিনে বন্ধুত্ব করে ফেলেছেন।

একদিন তাঁর ঘরে যখন জুতো খুলছেন, দেখতে পেলেন জানালা দিয়ে দু'জন জাপানী তাঁকে লক্ষ্য করছেন। তাঁর বাঁ হাতের পোড়া দাগটার দিকেই তাঁদের দৃষ্টি। পরের দিন সকালেও ঐ জাপানী দু'জনকে দেখা গেল। তিনি পথে বেরুলে তাঁরা পিছন থেকে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। রাসবিহারীর সন্দেহ দৃঢ় হলো এবং তিনি

পিছন ফিরে এগিয়ে গিয়ে তাদের সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে ওঁরা অনুসরণ করছেন কেন? উত্তর এল, তাঁরা বিদেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। রাসবিহারী তখন স্থানীয় পুলিশ কোর্টে গেলেন। সেখানেও একই উত্তর শুনলেন। ফেরার পথে তিনি সান-ইয়াৎ-সেনের বাড়ী গিয়ে চীনা নেতাকে সব কথা বললেন। সান-ইয়াৎ-সেন সব শুনে রাসবিহারীর সঙ্গে মিয়াজাকীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিয়াজাকী সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মিৎসু তয়ামা ও ডঃ ওখাওয়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

১৯১৫ সালের নভেম্বরে লালা লাজপৎ রায় জাপানে এলেন। ভারতীয়রা ইউয়েনো পার্কে একটি বিখ্যাত হোটেল-রেস্তোরায় এক সভার ব্যবস্থা করলেন। বড় হলটি কেবল জাপানী পতাকায় সজ্জিত হলো। মিৎসু তয়ামা, ডঃ সিউমেল ওখাওয়া ও বহু জাপানী যোগ দেন। ভারতীয় ছাত্র ও ব্যবসায়ীরাও উপস্থিত। রাসবিহারী বসু, হেরম্বলাল গুপ্ত প্রমুখও আসেন। সভার উদ্দেশ্য হলো, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে জাপান ও জাপানীদের সহানুভূতি ও সাহায্য আহরণ করা। লালাজীর ভাষণ আমন্ত্রিত জাপানীদের অভিভূত করলো। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ দূতাবাসের ক্রোধ বেড়ে গেল। কারণ, সভাস্থলে কোন ব্রিটিশ পতাকা রাখা হয় নি। এই হলো পয়লা ত্রুটি। দ্বিতীয়তঃ, সভায় জাপানী জাতীয় সঙ্গীত কেবল গীত হয়েছে। পি. এন. ঠাকুর যে রাসবিহারীর ছদ্ম পরিচয় তাও প্রকাশ পেয়ে গেল। সভার কার্যবিবরণী ও বক্তৃতাদির বিবরণ ব্রিটিশ দূতাবাসের ক্রোধ বাড়িয়ে দিল। তাঁদের পক্ষ থেকে জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে লালা লাজপৎ রায়, রাসবিহারী বসু ও হেরম্বলাল গুপ্তের অবিলম্বে বহিষ্কার দাবি করা হলো। জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তরকে ভারতীয় নেতাদের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ জারী করতে হলো। লালাজী যুক্তরাষ্ট্র চলে

গেলেন। কিন্তু রাসবিহারী ও হেরম্ব গুপ্ত, যাই ঘটুক, জাপানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। জাপানী পুলিশ-প্রধান তাঁদের পাঁচ দিনের মধ্যে জাপান ছাড়ার আদেশ দিলেন। মিঃ তয়ামা এই সঙ্কটের সময় সাহায্যের হস্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন। জাপানী সংবাদপত্রে এই বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানানো হলো।

তয়ামা কালো ড্রাগন দলের শক্তিশালী নেতা। তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প হলো, জাপান সরকার তাঁদের ব্রিটিশ বন্ধুদের বাধিত করার জন্য এই যে বহিষ্কার হুকুম জারী করেছেন, এথেকে দু'জন ভারতীয় রাজনীতিককে রক্ষা করতেই হবে। তিনি আপাততঃ একটা নিরাপদ জায়গার খোঁজে লোক পাঠালেন। ইয়োকোহামা থেকে ষ্টিমার যোগে রাসবিহারী ও হেরম্বলালের জাপান ছাড়ার শেষ তারিখ হলো ১৯১৫ সালের ২রা ডিসেম্বর। মিঃ তয়ামা তাঁদের উভয়কে নিজের বাড়ীতে সাময়িক আশ্রয় দিলেন।

১লা ডিসেম্বর দুই ভারতীয় নেতা একটি ছোট ঘরে অপেক্ষা করছেন। দুপুরের দিকে কয়েকজন সাংবাদিক তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখন তাঁদের চোখে পরের দিনের ছবি ভাসছে। অবশ্য তাঁদের আশঙ্কা সত্য হয় নি। পরের দিনের ছবি ভিন্ন রকম হলো। কারণ ঐ ১লা ডিসেম্বরই তাঁরা অন্তর্ধান করলেন।

অনুশীলনী

১। রাসবিহারী ও সান-ইয়াৎ-সেনের পরিচয় সম্বন্ধে যা জান লেখ। সান-ইয়াৎ-সেন তয়ামার সঙ্গে কেন রাসবিহারীর পরিচয় করিয়ে দেন?

২। রাসবিহারীর জীবনের যে সামান্য পরিচয় এই প্রবন্ধে আছে তাহা তোমার ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। প্রাচ্যের বিপ্লবীদের কোথায় আশ্রয়স্থল ছিল? সেখানে কোন্ কোন্ বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী এসেছিলেন? তাঁদের সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৪। কাঁরা ইউয়েনো পার্কে একটি বিখ্যাত হোটেল রেস্তোরায় সভার ব্যবস্থা করেন? সেই সভায় কে কে উপস্থিত ছিলেন? তাঁদের উদ্দেশ্য কি ছিল? এ সম্বন্ধে তোমার ভাষায় বিশদ বর্ণনা দাও।

৫। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) এশিয়ার ভবিষ্যৎ...আবর্তিত হয়। [অনু—১]

(খ) তখন তাঁদের চোখে...ভিন্ন রকম হলো। [অনু—৭]

৬। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

সহকর্মী, সংগ্রহ, দূতাবাস, ব্যর্থমনোরথ, হৃদ্যতাপূর্ণ, নির্ধারণ, বৈপ্লবিক, ভূমিকা, আবর্তিত, আত্মপরিচয়, অনুষ্ঠান, রহস্য, নৈশাহার, সম্প্রতিকালে, জন্মোৎসব, সাক্ষাৎকার, প্রতিশ্রুতি, বাজেয়াপ্ত, শীর্ষক, বিবৃতি, উল্লেখ, অনুসরণ, মুক্তি-সংগ্রাম, আহরণ, অভিভূত, ক্রোধ, কার্যবিবরণী, পররাষ্ট্র দপ্তর, অবিলম্বে, বহিষ্কার, সিদ্ধান্ত, সংকট বিরুদ্ধে, তীব্র, সঙ্কল্প, বাধিত, আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্ধান।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নামগ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাগ্‌যত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী—উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া

আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সে উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভর-শক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভর-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটি কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাঁহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে তাদের মধ্যে পাওয়া যায়; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের

মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ, আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয় চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই, নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই; অধিকন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দুঃখ অনেকের ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে ভয়ানক দুর্গম; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ বিদ্যাসাগর একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তখন তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন। অনেক পাশ্চাত্ত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলাদ কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বালক-বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পুর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরেজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালে ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটি যেমন হইয়াছিল ঠিক তেমনটি না হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন শেষদিন পর্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

অনুশীলনী

১। পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকে বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে কেন?

২। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি ?

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) বাগ্‌যত কর্মনিষ্ঠ……আকাশ-পাতাল ব্যবধান। [অনু—১]

(খ) বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। [অনু—২]

(গ) এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার…… স্পর্শ করে। [অনু—৩]

(ঘ) আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ……বিষয়। [অনু—৪]

(ঙ) অধিকন্তু পিতৃপিতামহ…… সমর্থ হইয়াছিলেন। [অনু—৫]

(চ) দুঃখ অনেকের ভাগ্যে ঘটে ; ··প্রকৃত বিরল। [অনু—৬]

(ছ) পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের···ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই। [অনু—৭]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

প্রবৃত্ত, নির্দিষ্ট, ব্যবহৃত, অহোরাত্র, আস্ফালন, চতুষ্পার্শ্বস্থ, ধবল, অতিক্রম, অসদ্ভাব, প্রাণিতত্ত্ববিদ, পর্যায়, অস্তিত্ব, সামর্থ্য, উৎপত্তি, দুর্দম, অব্যাহত, আবির্ভাব, দুর্ধর্ষ, বেগবত্তা, নিষ্প্রভ, আনুকূল্য, শোণিত, কণ্টক, সমাবেশ, দুর্গম, পরিবর্তিত, সম্যগ্‌ভাবে, পাকস্থলী, নিভৃত, তাৎপর্য, ব্যাহত, বিক্ষোভিত, ভূমিষ্ঠ, পাশ্চাত্ত্য, সাদৃশ্য, পৈতৃক।



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান : সিন্ধু নদতট ; দূরে গ্রীক জাহাজশ্রেণী।

কাল—সন্ধ্যা।

[নদতটে শিবির সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়াছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ; সূর্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।]

সেকেন্দার—সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় ; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এই আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর-গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।

সেলুকস—সত্য সম্রাট!

সেকেন্দার—কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহছায়ায় চারিদিকে জড়িয়ে পড়েছে, কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে' আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কান্তিজাতি এই দেশ শাসন কর্চ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে' আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে' আনি যখন সে কি বল্লে জানো?

সেলুকস—কি সম্রাট্!

সেকেন্দার—আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?'—সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!'—চমকিত হ'লাম! ভাবলাম এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ কর্লাম।

সেলুকস—সম্রাট্ মহানুভব।

সেকেন্দার—মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্তে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে! জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস—তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট্?

সেকেন্দার—সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কি আশ্চর্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে' চলে এসেছি! ঝঞ্ঝার মত এসে মহা-শত্রু সৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্ধেক এসিয়া মাসিডনের

বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হ'য়েছে। নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি, অর্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

(চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ)

সেকেন্দার—কি সংবাদ আন্টিগোনস্? ও কে?

আন্টিগোনস্—গুপ্তচর।

সেলুকস—সে কি!

সেকেন্দার—গুপ্তচর!

আন্টিগোনস্—আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে' নির্জনে শুষ্কতালপত্রে লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পার্লাম না।—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার—কি লিখ্‌ছিলে যুবক! সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত—সত্য বল্‌ব! রাজাধিরাজ। ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে এখনও শিখে নাই।

(সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন)

সেকেন্দার—উত্তম। বল কি লিখ্‌ছিলে।

চন্দ্রগুপ্ত—আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধিকাল ধ'রে শিখ্‌ছিলাম।

সেকেন্দার—কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত—এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার—সত্য সেলুকস?

সেলুকস—সত্য।

সেকেন্দার—[চন্দ্রগুপ্তকে] তার পর?

চন্দ্রগুপ্ত—তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি, তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার—কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত—সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে।

সেকেন্দার—তবে—

চন্দ্রগুপ্ত—তবে শুনুন সম্রাট্। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে' আমায় নির্বাসিত ক'রেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার—তার পর!

চন্দগুপ্ত—তারপর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা। অর্ধেক এসিয়া পদতলে দলিত করে', নদ নদী গিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে' শুন্‌লাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত ক'রেছেন। হে সম্রাট্! আমার ইচ্ছা হ'ল যে দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এসিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হ'য়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কর্চ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা শুদ্ধ আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

(সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন)

সেলুকস—আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগ্‌ত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা কর্তাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আন্টিগোনস্—কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস—এই যুবক।

আন্টিগোনস্—এই যুবক, না তুমি ?

সেলুকস—আন্টিগোনস্! আমার বয়স না মানো, পদবী মেনে চ'লো।

আন্টিগোনস্—জানি তুমি গ্রীকসেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস—আন্টিগোনস্!

(সেলুকস তরবারি বাহির করিলেন, আন্টিগোনস্ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।)

সেকেন্দার—নিরস্ত হও।

(সেই মুহূর্তেই আন্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল)

সেকেন্দার—আন্টিগোনস্!

(আন্টিগোনস্ লজ্জায় শির অবনত করিলেন)

সেকেন্দার আন্টিগোনস্! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত কর্লাম! একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্ধা!—আমি—এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্ধা হ'তে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাও এই মুহূর্তেই তোমায় নির্বাসিত কর্লাম।

[আন্টিগোনসের প্রস্থান]

সেকেন্দার—আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো যে, গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না—আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত—সম্রাট্!

সেকেন্দার—তোমায় যদি বন্দী করি ?

চন্দ্রগুপ্ত—কি অপরাধে সম্রাট্ ?

সেকেন্দার—আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে প্রবেশ ক'রেছো, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত—এই অপরাধে! ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহা বীর, দেখ্‌ছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত! সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার—সেলুকস! বন্দী কর!

চন্দ্রগুপ্ত—সম্রাট্! আমায় বধ না করে' বন্দী কর্ত্তে পার্বেন না।

(চন্দ্রগুপ্ত তরবারি বাহির করিলেন)

সেকেন্দার—[সোল্লাসে] চমৎকার! যাও বীর তোমায় বন্দী কর্ব না! আমি পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্বে। তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। যাও বীর। মুক্ত তুমি।

অনুশীলনী

১। 'সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ!'—সেকেন্দারের এই উক্তির সার্থকতা বর্ণনা কর।

২। এই দৃশ্যে সেকেন্দার ও চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

৩। ব্যাখ্যা কর:

(ক) দিনে প্রচণ্ড সূর্য……খেলা কর্চ্ছে। [অনু—১]

(খ) কোথাও দেখি……শাসন কর্চ্ছে। [অনু—৩]

(গ) তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি…সাহস। [অনু—৩]

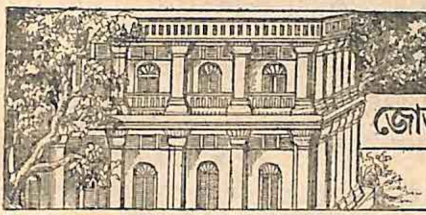
(ঘ) দূর মাসিডন……উড়িয়ে দিয়েছি। [অনু—৯]

(ঙ) নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল……শতদ্রুতীরে। [অনু—৯]

(চ) কি সে পরাক্রম ····বিচলিত হ'য়েছে। [অনু—৩০]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

অস্তগামী, তামসী, জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রাবৃট, অভ্রভেদী, তুষার-মৌলি, হিমাদ্রি, উচ্ছ্বাস, উদ্দাম, স্বেচ্ছাচার, মদমত্ত, মাতঙ্গ, জঙ্গমপর্বতসম, মন্থর, ভুজঙ্গম, বক্র, কুরঙ্গম, শূন্যপ্রেক্ষণে, বাত্যা, শৌর্য, প্রত্যাশা, নিষ্কম্প, প্রত্যর্পণ, দিগ্বিজয়, ঝঞ্ঝা, দুর্বার, নির্বাসিত, আর্যকুলরবি, ভ্রূকুটি, পুনরুদ্ধার, ক্ষিপ্র, ঔদ্ধত্যের, হৃতরাজ্য।



যাত্রী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যে পরিবারে জন্মেছিলুম সেটা আটপৌরে পরিবার ছিল না। এই পরিবারের জীবনযাত্রার নিজস্ব একটা সংস্কার ছিলো যেটাকে কোন প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব পশ্চিম নিঃশব্দে অত্যন্ত সহজভাবে মিলে গিয়েছিলো আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আমার জন্মের এক শতাব্দীরও আগে। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কোন চিন্তা, কোন অনুভূতিই এই বাড়ীতে অপাংক্তেয় ছিলো না। তিলক-কাটা নামাবলীপরা চিন্তা ছাড়া আর সব বর্জনীয় এই ধরণের উগ্রসংকীর্ণতা এ বাড়ীর আবহাওয়াকে যেমন কখনো বিষিয়ে দেয় নি, ঠিক তেমনই সমুদ্রের ওপর থেকে যা কিছু এসেছে তার মূল্য যাচাই না করে নির্বিচার গ্রহণ, এই মেরুদণ্ডহীন চিন্তার ক্লীবত্ব এ বাড়ীর বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে নি। ভারতবর্ষের বৃহৎ ধারণার সম্বন্ধে যেমন শ্রদ্ধা ছিলো, পাশ্চাত্যের বৃহৎ ভাবসম্ভারের প্রতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধা ছিলো না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মালাবদল ঘটে গিয়েছিলো জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গণে। দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিমিত ধন সঞ্চয় করেছিলেন ধন সঞ্চয়ের মামুলী পন্থা ধরেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে নুনের ইজারা নিয়ে তিনি অগাধ ধনের অধিকারী হন। তারপর

নানান ব্যবসায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় আমরা পাই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কল্পনা ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম করেন। লক্ষ্মীর পদ্মের সোণার পাপড়ি লুট করার নৈপুণ্যের মধ্যেই যদি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সব পরিচয় নিঃশেষ হোতো তাহলে অন্য ধনীর সম্বন্ধেও যেমন সত্যি করে বলবার কিছু থাকে না তাঁর সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটতো। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে ধনসঞ্চয়ের প্রয়াসেই তাঁর জীবনের সব পরিচয় শেষ হয়ে যায় নি।

সমাজের সমস্ত কুসংস্কারের গ্লানি থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবার কাজে তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের অন্যতম সাথী। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। শবচ্ছেদ যখন হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল তখন এই কুসংস্কার দূর করবার জন্যে যে হিন্দু শবচ্ছেদ করবে মেডিকেল কলেজে, তাকে অর্থ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তাঁর অকুণ্ঠিত দানের পরিচয় তখনকার প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁর যাতায়াত ছিল। সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু ধারণা তাঁকে বিচলিত করে নি।

তাঁর যুগের অবসানে যে যুগ স্থরু হলো, সেই যুগে পারস্য-আরব্যের ইসলামীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদ ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা, এই তিন স্থগভীর চিন্তাধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হলো জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই তিন ধারার সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। আমি যখন জন্মলাভ করি তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর স্থর ছিলো দেবেন্দ্রনাথের নিজের হাতের বাঁধা স্থর। সমস্ত বাড়ীটি ঘিরে ছিলো এক উদার দীপ্ত প্রশান্তি, তার স্থর তখনও নেমে যায় নি। তখন প্রদীপের সল্‌তেকে উস্কে দিয়ে আলো

জ্বালিয়ে রাখবার দরকার ছিলো না, প্রদীপের তেল তখনো তলানিতে এসে পৌঁছায় নি।

অনুশীলনী

১। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুসরণ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর পরিচয় দাও।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) পূর্ব পশ্চিম······অপাংক্তেয় ছিলো না। [অনু—১]

(খ) তিলক-কাটা······কলুষিত করে নি। [অনু—১]

(গ) লক্ষ্মীর পদ্মের······কথা খাটতো। [অনু—১]

(ঘ) তাঁর যুগের অবসানে······জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। [অনু—৩]

(ঙ) প্রদীপের সল্‌তেকে······এসে পৌছায় নি। [অনু—৩]

৩। অর্থ ও বানান অভ্যাস কর :

আটপৌরে, প্রচলিত, অপাংক্তেয়, নির্বিচার, মেরুদণ্ডহীন, ক্লীবত্ব, বায়ুমণ্ডল, কলুষিত, ভাবসম্ভার, পন্থা, সিদ্ধিলাভ, দূরদর্শিতা, নৈপুণ্য, প্রয়াস, শবচ্ছেদ নিষিদ্ধ, অকুণ্ঠিত, ত্রিবেণীসঙ্গম, সমন্বয়, দীপ্ত, প্রশান্তি, উস্কে, তলানি।



অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোশাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড়ো পুলিস-কর্মচারী। অপূর্বর পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরুব্বি। নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন, এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশী যুগে অপূর্ব যে ধরা প'ড়য়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহারই প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে ?

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর-দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েছে আর আমাকে হতে পারে না ? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার তো অফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চলো না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারি নি তার ঠিক নেই। মা ভালো আছেন ? দাদারা ?

সকলেই ভালো আছেন জানাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

জাহাজঘাটে। চলো না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে, তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিসের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কিনা তাই ভাবছি।

অপূর্ব মহপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহা-পুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেছেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই,—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কী, এবং কী নয় একথা ঠিক কেউ জানে না। এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে-চোখে রাখতে এত বড়ো গভর্নমেণ্ট যেন হিমশিম খেয়ে গেল।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী তো লোকে তোদেরও এক সময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ, শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না,—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বর্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন

ম্যাণ্ডেলে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা, রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন সঠিক সংবাদ নেই, —তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সে কথা ঠিক।...

অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কী করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম তো কখনো শুনেছি মনে হচ্ছে না।

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড়ো লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জুনের মতো দেশে দেশে কত নামই হয়তো এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়তো শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারছ না। আর, কী যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক্ ওয়াকিফহাল নেই। রাজ-শত্রুরা তো তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাক পিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনায় এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফা তিন বচ্ছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাস করেছে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারি পাস করেছে, বিলেতে আইন পাস করেছে, আমেরিকায় কী পাস করেছে জানি নে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,— এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার শামিল,—রিক্রিয়েশান,— কিন্তু, কিছুই কোনো কাজে এল না বাবা, এর সর্বাঙ্গের শিরা দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও,—ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম-কর্ম, না আছে কোনো ঘর-দোর,—বাপ্‌রে বাপ্! আমরাও তো এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মাল তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,—শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেষ্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে তো পাই।

অপূর্ব কহিলেন, ধরুন পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষ মুহূর্তে আর কোনো পথ দিয়ে কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তাহলে?

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবারই হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ্ করার মূল্য বেশি, এই তো সম্প্রতি গভর্নমেণ্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ তিনি যাই হন তবুও পুলিস। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, এঁর রয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কী রকম দেখতে?

এইটিই ভারি আশ্চর্য বাবা। এত বড়ো একটা ভয়ংকর লোকের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই তো এঁর হাঁটাপথে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, না-ও হতে পারে। হয়তো কী একটা মতলব আছে, হয়তো পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই

বলা যায় না অপূর্ব। এরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এরই ভুল কি আমাদেরই ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।

অপূর্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু!

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে পুলিসের কাছে এ কথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি তো একবার গিয়ে দেখে আসব। এই সামনের জেটিতেই বোধ হয় এদের স্টীমার লাগে,—আচ্ছা, তোমার আবার আফিসের সময় হয়ে এল,—নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভালো নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ আফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়ছি নে। আমি চাই নে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও তো একবার চোখে দেখতে পাব। চলুন।...

জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নরনারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না।...সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া

তাড়তাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কী করে পালাল?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানব তো সে কি পালায়? প্রায় শ' তিনেক যাত্রী, বিশ-পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ' দেড়েক হবে, বাকি বর্মা—সে যে কার পোশাক পরে আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা ন জানন্তি—বুঝলে না বাবাজি—আমরা তো পুলিস। চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন ছয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই—সে নয়। যাবে নাকি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন তো আমি যেতে চাই নে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিসকে যত মন্দ মনে করিস্, সবাই তা নয়। ভালো-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে তো তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব!

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন,

তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে। চলো একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিস-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল সুমুখের হল-ঘরে জন ছয়েক বাঙালী মোটঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোটো বড়ো পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা-অয়েল-কোম্পানীর তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, পোলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে সংসারের মিয়াদ আর তাহার দীর্ঘদিন আছে, ভিতরের কী একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়ো, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা,—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মতো কী যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই

প্রয়োজন। ইহারই কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।—কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কী বল অপূর্ব ?

এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড়ো বড়ো চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি,—অপর্যাপ্ত, তৈলনিষিক্ত কঠিন, রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুকপকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরনে বিলাতী মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ-করা পাম্প-শু, তলাটা মজবুত ও টেকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল-দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব কহিল, আর যাই হোক, যাঁকে খুঁজছেন তার কল্‌চরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কী হে ?

আজ্ঞে গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র ! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না ?— এখন রেঙ্গুনেই থাকবে ? তোমার বাক্স বিছানা তো খানাতল্লাশি হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁকে এবং পকেটে কী আছে ?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটা টাকা ও গণ্ডা ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও ?

লোকটি অসংকোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন ?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখো জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন। দেখি বাবা তোমার হাতটি ? এই বলিয়া সেই প্রবীণ, সুদক্ষ পুলিস-কর্মচারী মহাপাত্রের ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, অনেক গাঁজা তৈরির চিহ্ন এইখানে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,— এই তো তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাই নে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই,—এই মাত্র ! নইলে নিজে খাই নে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাই নে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার মহাপাত্র। কী বল জগদীশ, পারে তো? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ্ করবার দরকার নেই বড়োবাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে! বড়োবাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিস-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীরে মন্থর পদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

অনুশীলনী

১। নিমাইবাবুর 'মহাপুরুষটি'র পরিচয় দাও।

২। গিরীশ মহাপাত্রের রূপ বর্ণনা কর। তাহার সঙ্গে নিমাইবাবুর আলাপের কথা সংক্ষেপে বল।

৩। "জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাই নে!"—কাহাকে এই কথা বলা হইয়াছে? কি সাজার কথা জগদীশবাবু বলিয়াছেন এবং কোন্ কারণে 'সাজা'র কথা উঠিয়াছে বল।

৪। ব্যাখ্যা লিখঃ

(ক) মহাভারতের মতে……বেগে চলে। [অনু—১০]

(খ) এর সর্বাঙ্গের……স্বস্তি নেই! [অনু—১২]

(গ) এরা যে পথের…… পরীক্ষা হবে। [অনু—২৪]

(ঘ) সে চোখ আজও……বাঁচিয়া আছে। [অনু—৩৩]

৫। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর ঃ

মুরুব্বি, প্রাসাদ, সংবর্ধনা, মর্জি, প্রবলপ্রতাপান্বিত, সুলভ, অভ্রান্ত, সম্প্রতি, পদার্পণ, সওয়ার, প্রচলিত, সম্যক, পঞ্চভূত, স্বস্তি, সর্বান্তঃকরণে, উপক্রম, নিশ্চল, লাঞ্ছনা, মিয়াদ, আকৃষ্ট, তৈলনিষিক্ত, উত্তরীয়, সূক্ষ্ম, আপাদমস্তক, অদৃষ্ট, পর্যবেক্ষণ, বিদ্যমান, তোরঙ্গ।



এক বিশেষ ধরনের রাইফেল ব্যবহারের জন্যে এক প্রকার টোটাকে কেন্দ্র ক'রে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। জনসাধারণের মধ্যে নানা কারণে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। সিংহাসনচ্যুত রাজা মহারাজারা ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। এমন সময় এই বিশেষ ধরনের রাইফেলের টোটা তাদের সাহায্যে এল। এই টোটার প্রান্তভাগ দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে ব্যবহার করতে হ'তো। বুদ্ধিমান বিক্ষুব্ধ নেতারা রটিয়ে দিলেন যে এই টোটা তৈরী করতে গরু এবং শুয়োরের চর্বি দরকার হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদেরই ওই কৌশলে ক্ষেপিয়ে তোলা গেল। তাঁরা মনে করলেন সাহেবরা তাঁদের গরু এবং শুয়োরের চর্বির সাহায্যে ধর্মান্তরিত করে খ্রীষ্টান করতে চান।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে উনবিংশ দেশীয় পদাতিক বাহিনী ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭ প্রথম নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলো। ২৯শে মার্চ চৌত্রিশ দেশীয় পদাতিক বাহিনীর মঙ্গল পাণ্ডে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো—সহকর্মীরা তাকে যদিও সাহায্য করে নি তবু বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ তখন থেকেই জ্বলে উঠেছিল। মঙ্গলকে এবং তার বাহিনীর জনৈক জমাদারকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সমস্ত বাংলা বাহিনীতে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল—আম্বালা এবং লক্ষ্ণৌতে বিশেষ উত্তেজনা

লক্ষ্য করা গেল। এই ঘটনাই চরমে উঠলো মিরাটে—২৪শে এপ্রিল তৃতীয় অশ্বারোহী দলের বহু সৈনিক কুচকাওয়াজের সময় এই টোটা স্পর্শ করতে অস্বীকার করলো। এদের সামরিক আদালতে বিচার হ'লো—প্রত্যেকের ৫ থেকে ১০ বৎসরের জন্যে জেল হ'লো। ৯ই মে এদের কুচকাওয়াজের ময়দানে এনে অন্যান্য বাহিনীর সামনে সামরিক পোষাক খুলে নিয়ে শৃঙ্গলাবদ্ধ করা হয়—বিদ্রোহের আগুন এবার আর চাপা থাকে না।

১০ই মে তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনী কারাগার ভেঙ্গে সঙ্গীদের সঙ্গে আরও নানা ধরনের বন্দীকে মুক্ত করে দেয়। আরম্ভ হয় ইংরাজ হত্যার লীলা।

১১ই মে প্রত্যুষে মিরাট থেকে সিপাহীরা দিল্লি গিয়ে উপস্থিত হয় এবং লাল কেল্লায় গিয়ে নবাব বাহাদুর শা'কে নেতৃত্ব গ্রহণে অনুরোধ করে। অনেক ইতস্তত ক'রে বাহাদুর শা' স্বীকৃত হন এবং তাঁকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়।

দিল্লিতে ইউরোপীয় হত্যার উল্লাসে সিপাহীরা মেতে ওঠে—সামান্য কিছু সংখ্যক সাদা চামড়ার মানুষই পলায়ন করতে পেরেছিল।

বিদ্রোহীদের দ্বারা দিল্লি দখল এবং বাহাদুর শা'র সম্রাট রূপে ঘোষণা সমস্ত ভারতবর্ষে একটা উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ১লা জুলাইয়ের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো ফিরোজপুর, মজঃফরনগর, এটাওয়া, লক্ষ্মৌ, মোরাদাবাদ, আজমগড়, ফয়জাবাদ, বারাণসী, ফতেপুর, বেরেলী, ফতেগড়, হাতরাস প্রভৃতি স্থানে। সব জায়গাতেই সিপাহীরা হত্যার লীলায় মেতে উঠেছিল একথা বলা যায় না—বহু ইউরোপীয়কে তারা রক্ষা করেছে, বিপদ্‌জনক অঞ্চলের বাইরে চলে যেতে সাহায্যও করেছে।

নানা সাহেব ঃ শেষ পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেব কানপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন—নানা সাহেবের সহযোগী ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত তাঁতিয়া টোপী। কানপুরকে ইউরোপীয় মুক্ত করেন নানা সাহেব। ৩০শে জুন তাঁকে পেশওয়া বলে ঘোষণা করা হয়।

ঝাঁসীর রাণী ঃ যুমনা নদীর দক্ষিণে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঝাঁসীর ছ'টো কেল্লাই দখল করেন বিদ্রোহী সিপাহীরা। ঝাঁসীর শেষ রাজা গঙ্গাধর রাও-এর বিধবা পত্নী রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর দত্তক পুত্রকে স্বীকৃতি না দিয়ে ইংরাজ ঝাঁসী অধিকার করায় লক্ষ্মীবাঈ-এর ইংরাজবিরোধী মনোভাব ছিলই। তাই লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুকে তিনি শ্রেয় বলে মনে করেন।

শাহাজাদা ফিরোজ শাহ্ ঃ দিল্লির মোগল সম্রাটদের বংশধর শাহাজাদা ফিরোজ শা' মান্দাসরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তিনি শহর অধিকার করে নিজেকে রাজা ব'লে ঘোষণা করেন। পরে ইংরাজ মান্দাসর দখল করে নিলেও তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি। নানা স্থানে গিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঃ সমগ্র উত্তর ভারতেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। বঙ্গদেশেরও কোন কোন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজস্থানের আওয়ার সর্দার কুশল সিং, জগদীশপুরের রাজপুত জমিদার কানওয়ার সিং ইংরাজদের যথেষ্ট বিপদ্‌গ্রস্ত করেন। রোহিলখণ্ড ব্রিটিশরা দখল করেন। খান বাহাদুর খান বিদ্রোহীদের তরফে দিল্লির সম্রাটের অধীনে শাসনকর্তা বলে নিজেকে ঘোষণা করেন—তাঁর শাসনে হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখার ব্যবস্থা হয়।

রাজগীরের হায়দার আলী খান, আরওয়ালের যুধার সিং নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করে ইংরাজদের বিতাড়িত করেন।

পোড়াহাটের রাজা অর্জুন সিং এবং তাঁর ভাই সিংভূমের কোলদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ করেন। ১৮৫৯ সালের আগে এই বিদ্রোহ দমন করা ইংরাজের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

নীলম্বর সাই ও পীতাম্বর সাই-এর নেতৃত্বে পালামৌ-এর চেরো এবং খাইরাওরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জঙ্গলপূর্ণ এই পাহাড়িয়া অঞ্চলের বিদ্রোহ গেরিলা যুদ্ধের আকার গ্রহণ করে। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলেছিল।

সম্বলপুরের সুরেন্দ্র সাই ১৮২৭ সাল থেকেই ইংরাজ বিরোধিতা করছিলেন। ইংরাজ সরকারের পাশাপাশি ১৮৬২ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর সরকার চালিয়ে যান। ওই সময়ে তিনি আত্মসমর্পণ করলেও তাঁর অনুগামীরা ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। 'সিপাহী বিদ্রোহ' ঘটাবার সুযোগ কিসে এলো? এই বিদ্রোহের সূত্রপাত সম্বন্ধে যা জান বল।

২। সংক্ষেপে সিপাহী বিদ্রোহের পরিচয় দাও।

৩। সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার পরিচয় দাও।

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

বিক্ষোভ, বিক্ষুব্ধ, সম্প্রদায়, স্ফুলিঙ্গ, অশ্বারোহী, শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রত্যূষ, উন্মাদনা, আত্মসমর্পণ, বিধ্বস্ত।



স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়।
সার্থক জীবন আর বাহু বল তার হে,
বাহু বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান।
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান ?

ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান।
স্মরহ ইক্ষ্বাকু বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন।

অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কবি রঙ্গলাল যে আহ্বান জানিয়েছেন তার পরিচয় দাও।

২। (ক) স্বাধীনতা না থাকা কিসের সমান ?
(খ) দেশের জন্য আত্মনাশে কি ফল লাভ হয় ?
(গ) ক্ষত্রিয়দের আচরণ কি ?

৩। ব্যাখ্যা লিখ ঃ
(ক) কোটিকল্প……স্বর্গ-সুখ তায়। (পংক্তি ৫-৮)
(খ) আত্মনাশে……দেশের উদ্ধার। (পংক্তি ১১-১২)



বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"My native land, Good-night"
—*Byron*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ ;
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে,
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভূলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—

কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

অনুশীলনী

১। মধুসূদন বঙ্গভূমির কাছে কি চেয়েছেন ?

২। জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।

পংক্তি দুটো কার লেখা ? কবির খেদ নাই কোন ? এখানে কবি কোন্ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন ?

৩। "সেই ধন্য নরকুলে"—কবি কাদের ধন্য ব'লে মনে করেন ?

৪। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) রেখো, মা,……মনঃ কোকনদে। [পংক্তি ১-৪]

(খ) চিরস্থির কবে……অমৃত-হ্রদে ! [পংক্তি ১০-১৩]

(গ) অমর করিয়া বর……কি শরদে ! [পংক্তি ২২-২৫]

৫। অর্থ ও বানান অভ্যাস কর :

পরমাদ, মধুহীন, মনঃ কোকনদ, প্রবাস, দৈব, জীব-তারা, দেহ-আকাশ, খেদ, জীবন-নদ, শমন, মক্ষিকা, জন্মদে, সুবরদে, স্মৃতি-জল, মানসে, মধুময় তামরস।



আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম
লাগতেছিল চক্ষে মম—
কী বিচিত্র শোভা তোমার,
কী বিচিত্র সাজ!
আমি মনে ভাবতেছিলেম,
এ কোন্ মহারাজ!

আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো—
ভেবেছিলেম, তবে
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য
ছড়াবে দুই ধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
'আমায় কিছু দাও গো' ব'লে
বাড়িয়ে দিলে হাত!

মরি, একি কথা রাজাধিরাজ,
'আমায় দাও গো কিছু'!
শুনে ক্ষণকালের তরে
রইনু মাথা-নিচু।
তোমার কী বা অভাব আছে
ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে!
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কি!
ভিক্ষা-মাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।

দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে,
দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য ক'রে!

অনুশীলনী

১। কৃপণ কে? তাহার কৃপণতার কি পরিচয় কবিতাটিতে আছে তাহা বুঝাইয়া বল।

২। 'কৃপণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি বলিতে চাহিয়াছেন?

৩। "শুনে ক্ষণকালের তরে
রইনু মাথা-নিচু।"

কে মাথা নিচু করিয়াছিল? কোন্ কথা শুনিয়া সে মাথা নিচু করিয়াছিল? পরে সে কি করিল?

৪। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) অপূর্ব এক······বিচিত্র সাজ! [স্তবক—১]

(খ) তোমার কী বা······প্রবঞ্চনা। [স্তবক—৩]

(গ) দিলেম যা······ শূন্য ক'রে! [স্তবক—৫]

৫। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

স্বর্ণরথ, অপূর্ব, স্বপ্নসম, বিচিত্র, পোহালো, ধনধান্য, প্রসন্নতা, ব্যথা, অকস্মাৎ, ক্ষণকাল, কৌতুক, প্রবঞ্চনা, উজাড়।



ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—
সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি ।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি,
পাখীর ডাকে জেগে ;
(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি ।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস
কাহার দেশে !

(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি ।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে ;

(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি ।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ ;
—ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—
যেন এই দেশেতে মরি—

(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি ।

অনুশীলনী

১। কবির 'জন্মভূমি'র পরিচয় দাও।

২। কবি তাঁর জন্মভূমির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আজও কি একই রকম আছে ?

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) ধনধান্যপুষ্পভরা……দিয়ে ঘেরা ; [স্তবক—১]

(খ) চন্দ্র সূর্য গ্রহ……ডাকে জেগে ; [স্তবক—২]

(গ) এত স্নিগ্ধ নদী……কাহার দেশে [স্তবক—৩]

(ঘ) পুষ্পে পুষ্পে……মধু খেয়ে ; [স্তবক—৪]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

ধনধান্যপুষ্পভরা, বসুন্ধরা, তড়িৎ, জন্মভূমি, স্নিগ্ধ, ধূম্র, হরিৎক্ষেত্র, পুষ্প, শাখী, কুঞ্জ, গুঞ্জরিয়া, বক্ষ।

শূদ্র

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ও গো!
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য কেবা?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে।

অনুশীলনী

১। 'শূদ্র পাবন, পরশ তাহার পুণ্য সাথী' কবি শূদ্রকে লক্ষ্য করিয়া কেন এই কথা বলিয়াছেন সংক্ষেপে বল।

২। শূদ্র কেন ক্ষুদ্র নয়?—বুঝাইয়া বল।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) আদি দেবতার······মাথায় বহে। [স্তবক—২]

(খ) বিধাতার পাদ-পদ্মের······করিতে সেবা? [স্তবক—৩]

(গ) পাবনী গঙ্গা······পরশ তাহার পুণ্য সাথী। [স্তবক—৪]

(ঘ) শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত······ক্ষুদ্র নহে। [স্তবক—৬]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

গরীয়ান্‌, অতুল, বক্র, আদিদেবতা, পদরেণু, পাদ-পদ্ম, শিরোধার্য, দর্পিত, নাস্তিক, উপজে, পাবন, শোধন, ভুবন, শিয়র, শুদ্ধ-সত্ত্ব, পাবক, গ্লানি, মহামানব, মূর্ত।



বাসনা

শিবনাথ শাস্ত্রী

কবে আমি প্রেমদানে,   তুষিব জগত-জনে,
ভাই ব'লে দিব আলিঙ্গন ;
আপনি কাঁদি কাঁদিব,   কিন্তু যত্নে মুছাইব,
অশ্রুসিক্ত পরের নয়ন !

দূরে যাবে অহঙ্কার,   পড়ে র'ব সবাকার
পদতলে, ভৃত্য-সম হয়ে ;
অপরাধ যাব ভূলি',   ভালবাসা প্রাণ খুলি'
দিব সবে, অপমান সয়ে।

যার খরতর শরে,   জর্জর হব অন্তরে,
ধেয়ায়িব তাহারি কল্যাণ ;
কাঁদিব তাহারি তরে,   পড়িয়া প্রভুর দ্বারে,
হিত চাব বন্ধুর সমান।

ধন পদ জাতি যাবে,   সকলেই প্রেম পাবে,
হব আমি সকলের ভাই ;
দুঃখী ধনী নর নারী,   যে ডাকিবে আমি তারি,
দয়াময় এই ভিক্ষা চাই।

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে কবির যে বাসনার পরিচয় আছে তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) দূরে যাবে……অপমান সয়ে। [পংক্তি ৫—৮]

(খ) যার খরতর……বন্ধুর সমান। [পংক্তি ৯—১২]

(গ) ধন পদ জাতি……ভিক্ষা চাই। [পংক্তি ১৩—১৬]

৩। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

তুষিব, আলিঙ্গন, অশ্রুসিক্ত, খরতর, শর, জর্জর, ধেয়াইব, কল্যাণ, হিত, দয়াময়।

ফুলের ভাষা

প্রিয়ংবদা দেবী

রাঙ্গা গোলাপের ফুল হাসি-মুখে বলে
“হও নম্র, শুচি ও সুন্দর।”
সুসিত কমলগুলি সরসীর জলে
বলে, “হও ক্রমে শুভ্রতর!”

কনক-বরণ দীপ্ত ওই সূর্যমুখী
চেয়ে উর্ধ্বে নির্মল তপনে
বলে, “উচ্চে লক্ষ্য রাখ প্রেমে হও সুখী,
ধৈর্য ধর জীবনে-মরণে!”

যূথিকার কলি বলে, “প্রীতি কর দান,
ক্ষুদ্র হও, হ’য়ো না কৃপণ।”
শেফালি হাসিয়া বলে প্রফুল্ল-বয়ান,
“হিম বায় র’বে কতক্ষণ?”

এমনি কত না ফুল প্রতি দিন-রাতে,
হাসিমুখে বলে কত কথা,
সবারে মিলায়ে যদি ভাবি এক সাথে
পাই তবে দেবের বারতা।

অনুশীলনী

১। ফুলগুলি নিজের জীবন ও কার্যদ্বারা আমাদিগকে কি কি শিক্ষা দেয়?

২। সব কিছু মিলাইলে 'দেবের বারতা' পাইব একথা কবি কেন বলিলেন?

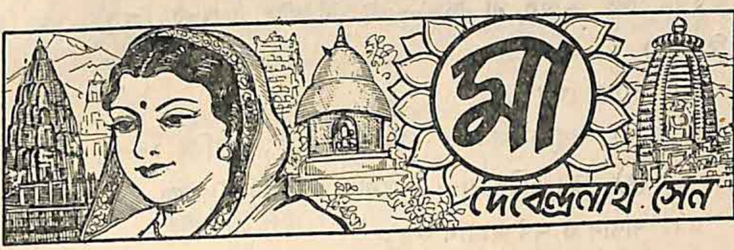
৩। গোলাপ, কমল, সূর্যমুখী, যূথিকার কলি এবং শেফালি কি কি কথা বলে?

৪। ব্যাখ্যা লিখ:

এমনি কত না ফুল……পাই তবে দেবের বারতা। [স্তবক—৪]

৫। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

নম্র, শুচি, সুসিত, কমল, সরসী, শুভ্র, কনক, দীপ্ত, ঊর্ধ্বে, নির্মল, তপন, হিমালয়, বারতা।



তবু ভরিল না চিত্ত ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
'জয় বিশ্বেশ্বর' বলি' ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে, পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জমালা ;
তবু ভরিল না চিত্ত ; সর্বতীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।

অনুশীলনী

১। কবির মতে ‘সর্বতীর্থ-সার’ কে ও কেন ?

২। ‘তবু ভরিল না চিত্ত’—এই উক্তিটির তাৎপর্য কি ? কেন চিত্ত ভরিল না ?

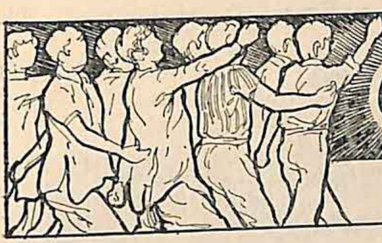
৩। ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) তবু ভরিল না……ত্রিবেণী সঙ্গমে ; [পংক্তি ১—৬]

(খ) তবু ভরিল না……এসেছি আবার। [পংক্তি ১৩—১৪]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

চিত্ত, তীর্থ, বন্দিনু, আরোহিয়া, ত্রিবেণী-সঙ্গমে, বিশ্বেশ্বর, ভৈরব, প্রফুল্ল আশ্রম, নিরখিয়া, উতলা, ভ্রমিলাম, বরগুঞ্জমালা।



অভিযান

কাজী নজরুল ইসলাম

নতুন পথের যাত্রা-পথিক !
চালাও অভিযান !
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
“মানুষ মহীয়ান।”

চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেল্‌বি কে আয় নতুন খেলা ?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান ?

পাতাল ফেড়ে চল্‌বি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান।

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।

আসবে রণ-সজ্জা কবে,
সেই আশায়-ই রইলি সবে !
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখী গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা-পথিক সব
এ উহারে হান্‌ছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চল্‌!
কুচ্‌কাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান!"

অনুশীলনী

১। 'অভিযান' কবিতায় নজরুলের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যক্ত কর।

২। ব্যাখ্যা লেখ :

(ক) জোয়ার জলে·····দিবি টান। [পংক্তি ৭—১০]

(খ) আঁধার ঘোরে·····কলরব। [পংক্তি ২১—২৪]

(গ) ঊষার দ্বারে·····নব উত্থান! [পংক্তি ২৯—৩০]

৩। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

অভিযান, উচ্চার, মহীয়ান, উজান, ফেড়ে, সমর, নাঙ্গা, আদুল, পোহাবে, প্রভাত, আত্মঘাতী, কুচ্‌কাওয়াজ, ঊষা, উত্থান।



পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকের নীড়ে
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখতে ঘিরে।
বাইরে যে জন বেরিয়েছে, সে ফিরবে নাক'
অচল তুমি, পথ চলা সুখ পাওনিক, তাই দাঁড়িয়ে থাক ;
সৃষ্টি কারর আনন্দ কী বিপুলতরা
—উষর মাটি শষ্পে ভরা।

অরণ্য গো, অরণ্য! হায় ডাকছো মোরে,
লক্ষ-শাখার ব্যাকুল বাহু প্রসার করে!
বিধুর তোমার ছায়া আমার পড়ছে বুকে—
মর্মরিয়া দীন মিনতি গুঞ্জরিছে আবোল-মুখে।
থামার সময় নেইক' আমার ; তোমার দেহে
রাঙিয়ে গেলাম সবুজ স্নেহে।

উপল! ওগো উপল! কঠিন শিকল-ডোরে
মিছাই তোমার প্রয়াস সখা বাঁধতে মোরে।
অচল হ'তে জন্মি' চলি অগাধ পানে—
সুনীল-আকাশ নীল সাগরের স্বপন দিল জাগিয়ে প্রাণে!

রঙ ছুটায়ে ফুল ফুটায়ে চলছি ছুটে,—
মত্ত গানের নৃত্যে লুটে !

তট ভূমি লো, তট ভূমি ! তোর প্রয়াস রাশি—
চিত্তে আমার দ্বিগুণ জাগায় উছল হাসি।
বাঁধতে ব্যাকুল উভয় বাহুর সীমায় বেড়ে,
তোর বাঁধনে পড়তে ধরা এলাম গিরি ঘর কি ছেড়ে ?
মাঝে মাঝে বিপুল ভাঙ্গন তাইতো আনি,—
বুঝিয়ে দিতে একটুখানি।

কুসুম, লতা, ক্ষেত্র, তরু, বন, পাথর, মাটি—
ডাকছে, "নদি" ! থাম গো, দিব পুলক বাঁটি !
চলার নেশায় মাত্‌লো যে জন, হায় গো তারে
এই ধরণীর অচল যারা—তারা কি কেউ বাঁধতে পারে ?
বন্ধুরা সব ! করতে হবে আমায় ক্ষমা,—
ধন্যবাদই রইল জমা।

আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্ররূপ,—
বাতাস দেছে পৌঁছে অতল-বার্তা অনুপ।
গান গেয়ে ঐ ডাকছে বিহগ,—"আয়লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপ্‌না সঁপে, ঊর্মিল হও স্বয়ংবরা—"
ঢেউগুলি মোর ভাবছে—সাগর কখন পাবো
যাবোই, ওগো ! যাবোই যাবো।

অনুশীলনী

১। ঝর্ণার আত্মকথা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। পাহাড়,' অরণ্য, উপল, তটভূমি এবং কুসুম-লতা-ক্ষেত ঝর্ণাকে কি বলে ডাকছে এবং ঝর্ণা তার উত্তরে কি বলে?

৩। ব্যাখ্যা কর:

(ক) অচল তুমি······শষ্পে ভরা। [স্তবক—১]

(খ) তট ভূমি লো······একটুখানি। [স্তবক—৪]

(গ) চলার নেশায় মাত্‌লো যে জন······বাঁধতে পারে? [স্তবক—৫]

(ঘ) আকাশ আমায়······যাবোই যাবো'। [স্তবক—৬]

৪। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

নীড়, বৃথা, অচল, ঊষর, শষ্প, বিধুর, মর্মরিয়া, আবোল, উপল, ডোর, প্রয়াস, অগাধ, চিত্ত, ব্যাকুল, পুলক, বাঁটি, ধরণী, আভাস, অতল-বার্তা অনুপ, বিহগ, ত্বরা, রত্নাকর, ঊর্মিল, স্বয়ংবরা।



উত্তম পুরুষ

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভিক্ষুক বলি তাকে—
"নাও নাও" ব'লে কখনো ডাকে না,
"দাও দাও" ব'লে হাঁকে।

ঘাতকেরও সেই ধারা—
প্রাণ নেবে শুধু, প্রাণ দেবে নাকো,
মারবে, যাবে না মারা।

ব্যবসায়ী তার নাম—
দেয় আর নেয় দুই হাতে তার,
দক্ষিণ আর বাম।

সৈনিক সেই মতো
প্রাণের বদলে প্রাণ দেয় নেয়,
ক্ষতের বদলে ক্ষত।

প্রেমিক তারেই মানি,
নেয় নাকো শুধু দিয়ে যায় সব,
রিক্ত উভয় পাণি।

ভাই, তুমি অভিনব,
প্রতিদান তুমি নেবে না, কেবল
দিয়ে যাবে প্রাণ তব।

তোমাদেরই দেওয়া প্রাণে
তোমাদের দেশ প্রাণ পাবে, আর
যুগ পাবে তার মানে।

আর কে বাঁচাবে বলো,
তোমরাই যদি হিসাবীর মতো
বিনিময় বুঝে চলো।

হে বন্ধু, হবে জয়।
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
ব্যর্থ হবার নয়।

অনুশীলনী

১। কোন্ ধরনের মানুষকে অন্নদাশঙ্কর বড় ব'লে মনে করেন তা বুঝিয়ে বল।

২। দেশপ্রেমিক-এর কাছে অন্নদাশঙ্করের দাবী কি?

৩। ভিক্ষুক, ঘাতক, ব্যবসায়ী, সৈনিক এবং প্রেমিকের কাজ কি?

৪। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) ব্যবসায়ী……বাম। [স্তবক—৩]

(খ) ভাই, তুমি……তব। [স্তবক—৬]

(গ) তোমাদেরই……মানে। [স্তবক—৭]

(ঘ) আর কে……চলো। [স্তবক—৮]

(ঙ) হে বন্ধু, ……নয়। [স্তবক—৯]

৫। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর:

ভিক্ষুক, ঘাতক, ব্যবসায়ী, রিক্ত, পাণি, অভিনব, প্রতিদান, বিনিময়, যজ্ঞ, আহুতি, ব্যর্থ।

প্রতিদান

জসীমউদ্দীন

আমার এ-ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী,—
পথে পথে আমি ফিরি তারি লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ-ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার একূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি ;
যে মোরে দিয়েছে বিষেভরা বাণ,
আমি দিই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর

অনুশীলনী

১। জসীমউদ্দীন-এর "প্রতিদান"-এর স্বরূপ প্রকাশ কর।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) যে মোরে করিল……তার ঘর। [স্তবক—১]

(খ) যে মোরে দিয়েছে……করেছে পর। [স্তবক—২]

৩। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

বিবাগী, দীঘল, রজনী, বাণ।



ঝড়ের রাত

সুনির্মল বসু

আকাশে আকাশে ঘন মেঘ জমে, 'গুরু গুরু' ডাকে বাজ,
বাতাসে বাতাসে প্রলয় ঘনায়, ভারি ছুর্যোগ আজ।
রাত্রি গভীর, চারিধারে ছাওয়া ঘন-ঘোর আঁধিয়ার,
নীরব নিঝুম সারা গ্রামখানি, পথে কেহ নাহি আর।
কিছুকাল আগে শিবাদল ডেকে এখন করেছে চুপ্,
মুষল-ধারায় বৃষ্টি কেবল ঝরিতেছে ঝুপ্ ঝুপ্।
এই ছুর্যোগে গহন নিশীথে পথ দিয়ে ও কে যায় ?
'কেলো' ওর নাম, বাগ্দীর ছেলে, তোমরা চেন না তায়।
কিবা হবে চিনে, গেঁয়ো ছোট-লোক, নাহি কোনো পরিচয়,
তবু তারি কথা বলিতে বসিয়া চোখে মোর ধারা বয়।
বিধবা মায়ের ছুইটি তনয়, এই নিয়ে সংসার,
কেলোর বয়স বারো বৎসর, ভিক্ষুর বয়স চার।
ছুখিনী বিধবা ছেলে ছুটি নিয়ে কষ্টে করিত বাস,
কিছুদিন আগে রোগে ভুগে সেও ফেলে শেষ নিঃশ্বাস।
মায়েরে হারায়ে সেই হতে কেলো ভিখুর নিয়েছে ভার,
ছোট শিশু ভিখু দাদারে ভিন্ন করেও না জানে আর।
কেলো ভালবাসে ভিখুরে বড়ই, আদরের ছোট ভাই,
মায়ের অভাব ঘুচাতে যে তার চেষ্টার ত্রুটি নাই।
ভাঙা-কুঁড়েটায় কোনোরূপে হায় মাথা গুঁজে তারা রয়,
সারা ছুনিয়ার মাঝখানে ছিল ঐটুকু আশ্রয়।

এখানে সেখানে মজুর খেটে সে পয়সা যা-কিছু পায়,
তাই দিয়ে অতি কষ্টে-সৃষ্টে দিনগুলি কেটে যায়।
কাজ শেষ করে' সন্ধ্যায় ফেরে, কভু হ'য়ে যায় রাত,
দুই ভাই মিলে কভু ছাতু খায়, কভু জুটে যায় ভাত।
কতদিন কেলো রাত করে' ফিরে দেখে তার ছোট ভাই,
কেঁদে কেঁদে যেন ঘুমায়ে পড়েছে, খাওয়া কিছু হয় নাই।
ভিখুরে জাগায়ে আদরে সোহাগে গালে দিয়ে তার চুম্,
খাবার খাওয়ায়ে আবার তাহারে দিয়েছে পাড়ায়ে ঘুম।
মায়ের জন্য ভিখু যদি কাঁদে, হু-হু করে তার প্রাণ,
নিজের দুঃখ অন্তরে চেপে করে সান্ত্বনা দান।

সেও তো বালক, ছোট শিশু সেও, তবু দায়িত্ব ঢের,
কেলোর বুকের দুখের আগুন কেহ নাহি পায় টের।
হাট হতে যবে ঘরে ফেরে কেলো, পয়সা জুটিলে তার,
ভিখুর জন্যে নিয়ে আসে কিনে খেলনা চটক্‌দার।
লাটিম, লাটাই, ঘুড়ি, রাঙা-লাঠি, যখনি সুবিধা হোক্,
মেলা হতে আনে ভাইটির তরে ঘুচাতে তাহার শোক।
সেই ভিখু, সেই প্রাণের ভাইটি কয়দিন হতে হায়,
অসুখে পড়েছে, বেহুঁস রয়েছে, নাহি কিছু খায় দায়।

গাঁয়ের লোকেরা গ্রাহ্য করে না, নাহি লয় বড় খোঁজ,
ভিখুর অসুখ মনে হয় যেন বেড়ে যায় রোজ রোজ!
'দাদা' বলে আর ডাকে না ভাইটি, কথা নাহি কিছু কয়,
দেখে শুনে তার শোচনীয় দশা কেলোর জেগেছে ভয়।
গাঁয়ে নাহি কোনো ভালো ডাক্তার, নাহি কোনো কবিরাজ,
মনে ভাবে কেলো ঔষুধের তরে শহরে যাবে সে আজ।

শহরে রয়েছে ডাক্তারখানা, আছে বড় ডাক্তার,
ভিখুর জন্যে ব্যবস্থা কিছু করিবেই এইবার।
চিকিৎসকেরে বুঝায়ে বলিবে, ধরিবে তাহার পায়,
ঔষুধ আনিয়া ভিখুরে খাওয়াবে, ভালো হয়ে যাবে তায়।
যদি কিছু দাম লাগে ঔষুধের, মনে ঠিক করে লয়,
সম্বল আছে কাঁসার থালাটি, করিবে সে বিক্রয়।
সব ঠিক করে' একদিন ভোরে হাতে লয়ে থালা খান,
বহুদূর সেই শহরের দিকে করিল সে প্রস্থান।
শহরে আসিতে দুপুর ঘনালো, সব শুনে ডাক্তার—
আন্দাজে পরে ঔষধ দিলো, কুইনান্ 'মিক্শ্চার'।
গ্রামের ব্যাধি তো ম্যালেরিয়া—তাই করে' ঠিক অনুমান,
রোগী না দেখেই কেলোর কথায় ঔষধ করে দান।
দুঃস্থ কেলোর অবস্থা বুঝে ডাক্তার সদাশয়,
শিশি ভরে তারে দিল ঔষধ, দাম কিছু নাহি লয়।
থালা বেচে কেলো দুই টাকা পেলো, খরচ হোল না আর,
টাকা দুটো তার ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে বাড়ী চলে এইবার।
আধ্‌খানা পথ পাড়ি দিল যেই হঠাৎ উঠিল ঝড়,
আকাশে আকাশে গরজি' উঠিল মেঘ সে ভয়ঙ্কর।
ওষুধ বগলে তাড়াতাড়ি চলে, মাঝে এক নদী রয় ;—
সন্ধ্যার আগে এই নদী পার হতে হবে নিশ্চয়।
দুর্যোগ ক্রমে বেড়ে বেড়ে ওঠে, তেড়ে তেড়ে ছোটে বায়,
নামিল বাদল, ঝম্ ঝম্ জল সুরু হয়ে গেল হায়!
পথ-ঘাট সব হোলো একাকার, নির্জন চারিধার,
ঘন-দুর্যোগে নদীতে আসিতে সন্ধ্যা হইল পার।

ছোট সেই নদী জলে ভরে' গেছে এসেছে ভীষণ বান,
উপায় বিহীন কেলো নদী-স্রোতে করিল লম্ফদান।
কেনো রূপে নদী সাঁতারি সাঁতারি অবশেষে পেল কূল,
ওষুধের শিশি যতনে আনিতে হয় নাই তার ভুল।
পার হয়ে নদী চলে নিরবধি,—তখন গভীর রাত,—
হঠাৎ কে যেন পিছন হইতে চাপিয়া ধরিল হাত।
বিজলী-আলোকে কেলো দেখে চেয়ে—গাঁয়ের চৌকিদার,
বজ্র-মুঠিতে চাপিয়া ধরেছে তুর্বল হাত তার।
বলে সে কেলোরে, "ধরেছি এবার,—ওরে বজ্জাত চোর,—
আঁধারে গা-ঢেকে চলেছিস কোথা ? মত্‌লব কিবা তোর ?
কাল রাতে গাঁয়ে হয়ে গেছে চুরি জমিদার বাড়ীতেই,
তোরই এই কাজ, ওরে ছুঁচো-পাজি, সন্দেহ কেনো নেই !
না হ'লে এ-রাতে, এই ঝড় জলে মানুষ তো কোন্ ছার,—
আশ্রয় ছেড়ে পথে-ঘাটে বার হয় না'ক জানোয়ার।"
চৌকিদারের কথা শুনে ভয়ে কাঁপিল কেলোর প্রাণ,
"ছেড়ে দাও আমি চোর নই—" কেলো উত্তর করে দান।
কেলোর কাঁদন, সব আবেদন হয়ে গেল নিষ্ফল,—
চৌকিদার সে গরজি' কহিল, "সঙ্গে কি আছে বল্" ?
থালা বিক্রীর তুটি টাকা শুধু ট্যাকে গোঁজা ছিল তার,
তাই গুঁজে দিয়ে তার হাতে কেলো পেয়ে গেল উদ্ধার।
বাড়িতে ফিরিতে দেরী হয়ে গেল,—কি করিছে ভিখু ভাই ?
তাড়াতাড়ি বাকী পথটুকু যেতে বারে বারে ভাবে তাই।
এই তুর্যোগে ভিখুর মনেতে কতই জাগিছে ভয়,—
ঐ তো অদূরে গ্রাম দেখা যায়, আর বেশী দূর নয়।

বাড়ী এলে কেলো, হায় হায় হায়, একি হোলো আজ হাল্—
ঝড়ের দাপটে জীর্ণ ঘরের উড়ে চলে গেছে চাল্।
খুঁটি নড়ে গেছে, মাটি ঝরে গেছে, পাড়ে গেছে তার ঘর,—
ভয়াবহ এই দৃশ্যে কেলোর কেঁপে ওঠে অন্তর !
"ভিখু-ভিখু, ওরে ভাইটি আমার,—কেমন আছিস বল্ ?"
পাগলের মত ভাঙা-ঘরে ঢোকে, চোখে ঝরে যায় জল।
"এই যে এনেছি ওষুধ এবারে, আর তোর ভয় নাই,—
দেরী হয়ে গেল, ক্ষমা কর্ মোরে, কথা বল্ ভিখু ভাই।"
কে বলিবে কথা ? কেলো দেখে চেয়ে দেওয়ালের কোণটায়।
ভিখুর স্তব্ধ দেহ পড়ে আছে জলে-ভেজা বিছানায় !
দেহ প্রাণ নাই, অসাড় সে দেহ, বুকে নাই স্পন্দন,
জড়ায়ে ধরিয়া ভাইটির দেহ কেলো করে ক্রন্দন।
রজনীর শেষে ঝড় থেমে গেছে,—বৃষ্টি ঝরিয়া যায়—
ভাইটিরে বুকে চেপে কেলো কাঁদে—"ফিরে আয় ফিরে আয় !"

অনুশীলনী

১। 'ঝড়ের রাতে' কবিতায় যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

২। ভিখুর জন্য কেলোর ঔষধ-সংগ্রহের কাহিনী সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা দাও

৩। চৌকিদারের হস্তে কেলো কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল ? কি ভাবে সে নিষ্কৃতি পেল। এ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। 'ঝড়ের রাতে' কবিতার তাৎপর্য কি ?

৫। বানান ও অর্থ অভ্যাস কর :

আঁধিয়ার, মুষল-ধারায়, সোহাগ, সান্তনা, চটকদার, শোচনীয়, চিকিৎসক, মিকশ্চার, দুঃস্থ, দুর্যোগ, চৌকিদার, দাপট, জীর্ণ, ভয়াবহ, স্পন্দন।